সংবাদ
তারিখ 24 DEC 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

শিক্ষার উন্নয়নে উপবৃত্তির গুরুত্ব ও প্রতিফলন

অধ্যক্ষ গোলসান আরা বেগম

মাধ্যমিক স্তরে সরকারি কোষাগার হতে পঞ্চম শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নরত সব ছাত্রীকে টিউশন ফি এবং কিছু শর্তসাপেক্ষে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ শ্রেণীতে ছাত্রী প্রতি মাসিক যথাক্রমে ২৫, ৩০, ৩৫, ৬০ টাকা করে উপবৃত্তি প্রদান করে। অপরপক্ষে ৬ষ্ঠ, ৮ম প্রত্যেক শ্রেণীতে ছাত্রীপ্রতি মাসিক ১৫ এবং ৯ম, ১০ম শ্রেণীর প্রত্যেকের বিপরীতে ২০ টাকা করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয় টিউশন ফি। সব ছাত্রীকে উপবৃত্তি পেতে হলে বার্ষিক পরীক্ষায় ন্যূনতম পক্ষে শতকরা ৪৫ নম্বর হতে হবে। বিবাহিত ছাত্রীরা এবং যারা ফেল করে তারা উপবৃত্তি পাবে না। কিন্তু ওই ছাত্রীদের নামে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান টিউশন ফি পেয়ে থাকে। উপবৃত্তি প্রদান করে শুধু যে নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করা হয়েছে তাই নয়, বাল্য বিয়েকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষার একাত্তর পেরিয়ে ১৪ কোটি জনবসতির বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশে নানা বিভিন্ন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্গতির বসান ঘটেনি। বরং নৈতিক অবনতি ও সামাজিক অবক্ষয় ঘটেছে নানা স্তরে ব্যাপকভাবে। আমরা সঠিক দিকনির্দেশনার কারণে জাতিকে একটি সুস্থ রাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি উপহার দিতে পারছি না। বরং মিথ্যা বলার কালচার, সংবিধান পরিবর্তন, ক্ষমতার লড়াই, গণতন্ত্রের অপব্যবহার ইত্যাদি অহেতুক ঝুটঝামেলার ভেতর দিয়েই ১৪ কোটি কোটি মানুষের সমাজ বয়ে চলেছে অব্যাহত ধারায়। অন্তহীন ভোগান্তির অবসান ঘটাতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন গণতান্ত্রিক উত্তরণের প্রয়োজনে জাতিকে শিক্ষিত করা। এ প্রয়াসে চলছে সরকারি-বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বহু পদক্ষেপ, চেষ্টা পরিকল্পনা নিরলসভাবে। এরই ধারাবাহিকতা ক্রমে নারী সমাজকে শিক্ষিত করার তাগিদে প্রথম হতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে করা হয়েছে অবৈতনিক, দেয়া হচ্ছে বইখাতা ক্রয়সহ আনুষঙ্গিক ব্যয় মেটানোর উপবৃত্তি। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রদত্ত টিউশন ফি ও উপবৃত্তি প্রক্রিয়াটি শিক্ষার উন্নয়নে কতটুকু ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া উপবৃত্তির গুরুত্ব, এর ব্যর্থতা বা সফলতার প্রতিফলনই বা কি, তা পর্যালোচনা করা একান্তভাবে প্রয়োজন।

কোন একটি বিশেষ মহলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে শিক্ষার উন্নয়নকে অগ্রগামী করতে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত নারী শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হবে। সহজ-সরলভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, নারী শিক্ষা উন্নয়নে সরকারের কোষাগার হতে টিউশন ফি প্রদান প্রক্রিয়াটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এই দুর্লভ সুযোগ কাজে লাগিয়ে নারীরা শিক্ষিত হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নারীরা বড় অভাগা। আদিকাল থেকেই নিয়মনীতির পরতে পরতে হয়েছে তাদের জন্য কালো আইনের ফাঁকফোকর। নারী শিক্ষায় উপবৃত্তি ও টিউশন ফি প্রদানের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

শিক্ষার উচ্চমাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু নিয়মনীতি জুড়ে দেয়া হয়েছে। যেমন একাদশ বা দ্বাদশ ওই শ্রেণীতে অধ্যয়নরত বিবাহিত যারা তারা উপবৃত্তি পাবে না। তবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ওই ছাত্রীর নামে বরাদ্দকৃত টিউশন ফি পাবে। কোন প্রতিষ্ঠানে একশ জন ছাত্রী অধ্যয়নরত থাকলে ওই প্রতিষ্ঠান একশ জনের টিউশন ফি পাবে। কিন্তু সব ছাত্রীই উপবৃত্তি পাবে না। যাদের এসএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ সর্বনিম্ন ২.৫ এবং এর ওপরে তারাই শুধু একাদশ শ্রেণীতে উপবৃত্তি পাবে। দ্বাদশ শ্রেণীতে উপবৃত্তি পেতে হলে শিক্ষার্থীকে একাদশ শ্রেণীর সমাপনী ও নির্বাচনী পরীক্ষায় সর্বনিম্ন ৪৫% নম্বর পেতে হবে। একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বই ক্রয়ের জন্য পায় ২৫০ টাকা, আবার দ্বাদশ শ্রেণীর মেয়েরা ফরম ফিলাপ করার ব্যয়ভার বহন করতে পায় বিজ্ঞানের ৫০০ ও অন্যরা ৪০০ টাকা। তারপরও কেন মেয়েরা পড়াশোনা করতে আগ্রহী হবে না। নারী শিক্ষা অবৈতনিক হওয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ছাত্রী বেতন মওকুফ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু না, সেখানে রয়েছে একটা ভিন্ন চিত্র। যেমন কোন প্রতিষ্ঠানের গভর্নিংবডি কর্তৃক ছাত্রী বেতন যদি মাসিক ১০০ টাকা নির্ধারিত থাকে, তাহলে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত ৪০ টাকা টিউশন ফি বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ৬০ টাকা প্রতিষ্ঠানকে দিতে হবে। আরও দিতে হয় অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফি, সেশন চার্জ, ভর্তি ফি ইত্যাদিসহ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য চার্জ। সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে টিউশন ফি ও উপবৃত্তি প্রদান করলেও নারী শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে ব্যয়বিহীন নয়। তারপরও বলব, সরকারসহ বিভিন্ন এনজিও অর্থ দিয়ে যেভাবে উৎসাহ জুগিয়ে যাচ্ছে তাতে নারী শিক্ষা ঊর্ধ্বগামী হতে বাধ্য। বাস্তব ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। এক সময়ে ২% মেয়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পরিবেশ ছিল। আজকাল নিম্নস্তর থেকে শুরু করে উচ্চস্তর পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষার অংশগ্রহণ ছেলেদের সমপর্যায়ে রয়েছে। এমনকি কিছু কিছু স্তরে মেয়েদের আধিক্যই বেশি। পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের (এসএসসি, এইচএসসি ও ডিগ্রি) দিকে চোখ রাখলে দেখা যায়, শুধু মেয়েদের অংশগ্রহণই বৃদ্ধি নয়, মেধায়ও তারা পিছিয়ে নেই।

মাধ্যমিক স্তরে সরকারি কোষাগার হতে পঞ্চম শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নরত সব ছাত্রীকে টিউশন ফি এবং কিছু শর্তসাপেক্ষে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ শ্রেণীতে ছাত্রী প্রতি মাসিক যথাক্রমে ২৫, ৩০, ৩৫, ৬০ টাকা করে উপবৃত্তি প্রদান করে। অপরপক্ষে ৬ষ্ঠ, ৮ম প্রত্যেক শ্রেণীতে ছাত্রীপ্রতি মাসিক ১৫ এবং ৯ম, ১০ম শ্রেণীর প্রত্যেকের বিপরীতে ২০ টাকা করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয় টিউশন ফি। সব ছাত্রীকে উপবৃত্তি পেতে হলে বার্ষিক পরীক্ষায় ন্যূনতম পক্ষে শতকরা ৪৫ নম্বর হতে হবে। বিবাহিত ছাত্রীরা এবং যারা ফেল করে তারা উপবৃত্তি পাবে না। কিন্তু ওই ছাত্রীদের নামে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান টিউশন ফি পেয়ে থাকে। উপবৃত্তি প্রদান করে শুধু যে নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করা হয়েছে তাই নয়, বাল্য বিয়েকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, সে দশম শ্রেণীর নির্বাচনী পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারলে (জুলাই-ডিসেম্বর) ছয় মাসের উপবৃত্তি পাবে। এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে পুনরায় (জুলাই-ডিসেম্বর+জানুয়ারি-মার্চ) নয় মাসের উপবৃত্তি ও ফরম ফিলাপের ব্যয় বাবদ অতিরিক্ত ৫৫০ টাকা পাবে প্রতি ছাত্রী। নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অনুত্তীর্ণ সব ছাত্রীর বিপরীতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান (জুলাই-ডিসেম্বর) ছয় মাসের টিউশন ফি পাবে। এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রতি ছাত্রীর জন্য আবার নয় মাসের টিউশন ফি পাবে প্রতিষ্ঠান।

জাতীয় শিক্ষা উন্নয়নের ঊর্ধ্বগামিতা ব্যাহত হয় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার গতি-প্রকৃতি দ্বারা। এই স্তরের ঝরেপড়া শিক্ষার্থীর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি নয়, শুধু মারাত্মক। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সরকারসহ দেশী-বিদেশী এনজিও ও আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারকরা খুবই আন্তরিক ও উদগ্রীব। এখানে শুধু মেয়ে নয়, বিশেষ শর্তসাপেক্ষে ছেলেমেয়ে উভয়কে মাসিক ১০০ টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। এ উপবৃত্তি পেতে হলে শিক্ষার্থীকে শতকরা ৮৫ দিন শ্রেণী পাঠে উপস্থিত থাকতে হবে, পরীক্ষায় পেতে হবে সর্বনিম্ন ৪৫% নম্বর। দিনমজুর, জেলে, তাঁতি, দুস্থ ও বিধবা মাতা ইত্যাদি দরিদ্র স্তরের অভিভাবক, পিতামাতার সন্তানই এই উপবৃত্তি পাবে। যাদের ভূমি ৫০ শতাংশের নিচে রয়েছে তাদের সন্তানরাও এ উপবৃত্তির আওতাভুক্ত।

যারা ফেল করে বা শ্রেণী অতিক্রম করতে পারে না তাদের উপবৃত্তি বন্ধ হয়ে যায়। এই ধরনের উপবৃত্তির জন্য প্রথম শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর হার ও উপস্থিতি দুটোই বৃদ্ধি পেয়েছে। একই পরিবারে দুই সন্তান অধ্যয়নরত থাকলে সে পরিবার পাবে ১২৫ টাকা। যারা বাস্তবিক অর্থে তাদের শিশুসন্তান শিক্ষিত করতে চায়, তাদের জন্য এই অর্থনৈতিক বেনিফিটটি খুবই সহায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এক শ্রেণীর পরিবার রয়েছে যারা শুধু অর্থপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সন্তানকে স্কুলে পাঠায়, সেক্ষেত্রে অর্থের অপচয় বৈ শিক্ষার কোন কাজ হচ্ছে না। অধিক জনসংখ্যা বহুল আমাদের দেশটিতে মাত্র ৪০% দরিদ্র শিক্ষার্থীকে মাসিক ১০০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করে উদ্দেশ্য, আদর্শ বাস্তবায়িত হচ্ছে না। তাই প্রাইমারি শিক্ষকরা প্রস্তাব রাখছে এই উপবৃত্তি প্রদান প্রক্রিয়ায় সংস্কার আনয়নের জন্য। তারা বলছেন ১০০ টাকার পরিবর্তে ৫০ টাকা করে উপবৃত্তি প্রদান করলে বৃত্তির হার ৮০%-এ উন্নীত হবে। ফলে গাঁও-গেরামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সবাইকে খুশি করা যাবে এবং উপবৃত্তি প্রদানের ... পাওয়ার হবে।

এই উপবৃত্তি প্রচলনের ফলে আজকাল ধনীর বাসায় শিশু বয়সের ছেলে মেয়েকে গৃহদাস হিসেবে শ্রম দিতে দেখা যায় না। চায়ের দোকানে, গার্মেন্টসে, গাড়ির গ্যারেজসহ আরও বিভিন্ন স্তরে স্বল্প পারিশ্রমিকে শিশু শ্রমের পরিমাণও হ্রাস পেয়েছে। তবে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেলেও গুণগতমান বাড়েনি। কেননা নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠী তাদের সন্তানকে স্কুলে পাঠায় শুধু উপবৃত্তি প্রাপ্তির আশায়। সন্তান ঠিকমতো পড়াশোনা করে কি না সেদিকে গুরুত্ব দেয় না। শত ব্যর্থতার পরও বলব, উপবৃত্তি প্রদান প্রক্রিয়াটি অবশ্যই শিক্ষা বিস্তারে ও প্রসারে ইতিবাচক ফলপ্রসূ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। গরিবের সন্তান স্কুলে আসুক, অন্ততপক্ষে সাক্ষর হোক। সাক্ষর হতে হতে একদিন জাতীয় শিক্ষার হারকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছে দেবে। রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে উপবৃত্তি প্রদান ও সবার জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক, শিক্ষা জরিপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সরকারি প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়মুখী করার প্রচেষ্টা রয়েছে অব্যাহত। তারপরও দিনমজুর, রিকশাওয়ালা, ঠেলাগাড়িওয়ালা, কৃষক, তাঁতি ইত্যাদি হতদরিদ্র মা-বাবার সন্তানরা প্রথম শ্রেণীতে পা রাখলেও অভাব-অনটন, অজ্ঞতার কারণে পঞ্চম শ্রেণীর সিঁড়ি ডিঙাতে পারে না।

প্রথম হতে ৫ম শ্রেণীর প্রতিটি সীমানা অতিক্রম করতে গিয়ে ঝরে পড়ে অসংখ্য শিক্ষার্থী। এরাই হয় পথশিশু, পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার অভাবে নিজেকে নিযুক্ত করে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক অপকর্মে। বেকার, দরিদ্র, মস্তান, গুণ্ডা ইত্যাদি শ্রেণীর মাথা বোঝাই করে এরাই। জাতীয় উন্নয়নের মানদণ্ড বাড়াতে হলে, আলো ঝলমল সভ্যতায় জাতিকে মানানসই করে নিতে হলে এই পথহারা শিশুদের পুনর্বাসনে আরও যৌক্তিক পদক্ষেপ নিতে হবে।

২০০৬ সালে শিক্ষক আন্দোলনের পর প্রাথমিক স্তর হতে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক-কর্মচারীদের ৫% বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। আরও ৫% বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়া রয়েছে ঝুলন্ত। বিনিময়ে বলা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানকে তার আয়ের অর্থ সরকারের কোষাগারে জমা দিতে হবে। তবে কি প্রক্রিয়া বা কী পদ্ধতি অবলম্বন করে টাকা ফেরত দিতে হবে তা এখনও সুস্পষ্ট নয়। গাঁও-গেরামের প্রতিষ্ঠান যাদের আয় শূন্যের কোঠায়, তারা কী করবে? আবার যেসব প্রতিষ্ঠানের আয় লাখো কোটি তারাই-বা কী করবে? এই সূত্র ধরে মেয়েদের নামে প্রদানকৃত টিউশন ফি বন্ধ করে দেবে না তো সরকারি কর্তৃপক্ষ?

জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো শিক্ষার উন্নয়ন বিনামূল্যে বই বিতরণ, উপবৃত্তির প্রচলন, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, আসবাবপত্র সরবরাহ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের অনুদান ইত্যাদি বিভিন্ন সহায়তা সরকার নিরলসভাবে করে যাচ্ছে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষার উন্নয়নে। শিক্ষা নামক এই বৃহৎ সামাজিক সেক্টরটিকে জাতীয় প্রয়োজনে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা অর্থাৎ সরকারিকরণ করা দরকার। এও সম্ভব হবে সরকার শিক্ষা এবং শিক্ষকদের প্রতি সদয় ও আন্তরিক হলে।

শিক্ষার প্রথম স্তর হতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উপবৃত্তি ও টিউশন ফি প্রদান প্রক্রিয়াটি অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। এর বাস্তব প্রয়োগ সার্থক হয়ে পথহারা শিশু, টোকাই, দুখাই, শিশুশ্রমিক, ঝরেপড়া শিক্ষার্থী ইত্যাদি নানা কিসিমের শিশু উঠে আসবে আলোময় জগতে। আশাব্যঞ্জকভাবে আমাদের সমাজকে, প্রাত্যহিক জীবন যাত্রাকে অপরিণামদর্শিতার হাত থেকে রক্ষা করে, জাতীয় উন্নয়নকে করবে অগ্রগামী। পাশাপাশি নারী নির্যাতন, বাল্য বিয়ে, যৌতুকপ্রথা, ফতুয়ার অপপ্রয়োগ ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধি হ্রাস পাবে। মেয়েদের মেরুদণ্ড সোজা করে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার স্বপ্নকে উপবৃত্তির অর্থ জুগিয়ে যাবে পেট্রল হিসেবে সঞ্জীবনী শক্তি। পরিশেষে বলব, সার্থক হোক উপবৃত্তি ও টিউশন ফি প্রদানের উদ্দেশ্য, এবং আকর্ষণীয় ও সফল হোক এর প্রয়োগ।